দীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

দীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.amarboi.org

তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৯
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০৮

দীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ফোন ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৭
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৮
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৯
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০১০

নির্ধারিত মূল্য : বারো টাকা মাত্র

www.amarboi.org

ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা কমপক্ষে ৮৫ জন মুসলিম। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং কুরআনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার সরকারি ব্যবস্থা না থাকায় ঈমান, ইলম ও আমলের দিক দিয়ে উন্নত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক, ওয়ায়েয ও মুবাল্লিগগণের মাধ্যমে জনগণ ইসলামের কিছু শিক্ষা লাভ করে।

কিন্তু দীন ইসলাম সম্পর্কে যারা জনগণকে শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে এমন গলদ বা ভুল রয়েছে, যার কারণে শিক্ষাদানের মহান উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না।

ইসলামের প্রথম শিক্ষাই হলো ঈমানের শিক্ষা। ঈমান শিক্ষাদানের মধ্যেই বুনিয়াদী গলদ রয়েছে। ঈমানের পরই নামাযের গুরুত্ব। নামায শিক্ষাদানেও বুনিয়াদী ত্রুটি রয়েছে। এসব সম্পর্কেই এ বইটিতে আলোচনা করছি।

ইসলামের কতক মৌলিক পরিভাষা সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলিম জনগণের মধ্যে দীন ইসলাম সম্পর্কে যেটুকু ধারণা আছে, এর সবটুকুই আলেমসমাজের অবদান। তাদের এটুকু খিদমত না হলে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। যারা ইসলামী শিক্ষাদানের মাধ্যমে জনগণের উস্তাযের মর্যাদা লাভ করেছেন, তারা যদি এ বইটি থেকে উপকৃত হন তাহলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে শ্রদ্ধেয় খাদেমে দীনগণের নিকট আবেদন জানাই, যাতে তাঁরা মেহেরবানী করে এ বইটির আলোচনাকে বিবেচনা করেন। এতে কোনো ভুল থাকলে আমাকে তা জানিয়ে বাধিত করার জন্য অনুরোধ জানাই।

গোলাম আযম
৬ জুলাই, ২০০৮
২ রজব, ১৪২৯

www.amarboi.org

সূচিপত্র

দীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ	৫
ছোটদেরকে দীন শিক্ষাদান	৫
এটুকু শুধু ধর্মীয় শিক্ষা	৬
স্কুলে দীনীয়াত শিক্ষা	৬
মাদরাসায় দীনী শিক্ষা	৮
ঈমান শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ	৯
কালেমার মর্ম বুঝতে হবে	১০
বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়	১১
ঈমানদার হিসেবে চলার জন্য ইসলামের ইলম বা জ্ঞান জরুরি	১৩
মুসলমানের ঘরে পয়দা হলেই কি মুসলমান হয়ে যায়?	১৪
নামায শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ	১৫
কুরআন শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ	১৯
তিন তাসবীহ শিক্ষাদানে গলদ	২১
ইসলাম শিক্ষাদানে নারী ও পুরুষের পার্থক্য	২১
দাওয়াতে দীনে নারী-পুরুষে পার্থক্য	২২
কতক ইসলামী পরিভাষার সংকীর্ণ বা ভুল অর্থ	২৩
১. ইলাহ	২৩
২. দীন	২৩
৩. ইবাদাত	২৩
৪. জিহাদ	২৪
কতক শব্দের ভুল ব্যবহার	২৫
রওযাহ	২৫
মীলাদ	২৫
কতক ভিত্তিহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান	২৬
১. ভাগ্যরজনী পালন	২৬
২. বিশেষ ধরনের 'মীলাদ শরীফ'	২৭
মীলাদে কিয়াম সম্পর্কে দুজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কথা	২৮
৩. কুলখানি	২৯
৪. চেহলাম	২৯
নাম রাখার দায়িত্ব পালনে গলদ	৩০

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দীন ইসলামের শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

আমাদের দেশে দীন ইসলাম শিক্ষাদানের তিন-চার রকম ব্যবস্থা আছে:

১. পাড়াগাঁয়ে মসজিদে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কুরআন ও নামায শিক্ষাদান করা হয়।

২. শহরে যারা নামায-রোযা করে তারা সচ্ছল হলে বাসায় ছেলেমেয়েদেরকে কুরআন ও নামায শেখানোর জন্য কারী নিয়োগ করে।

৩. স্কুলে দীনীয়াত নামে ধর্মশিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে।

৪. মাদরাসায় গোটা পাঠ্যতালিকায় দীন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

ছোটদেরকে দীন শিক্ষাদান

গ্রামাঞ্চলে মসজিদে ও শহরাঞ্চলে বাসায় ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে আরবীতে কুরআন তিলাওয়াত করা ও নামায শেখার যে ব্যবস্থা আছে তা প্রায় সর্বত্র একই মানের। এটুকু শিক্ষাই ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষকদের মধ্যে যারা সহীহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, তাদের ছাত্র-ছাত্রীরা সহীহ পড়াই শেখে। যদি কোনো শিক্ষকের পড়া অশুদ্ধ হয় তাহলে তার ছাত্র-ছাত্রীরা অশুদ্ধ পদ্ধতিতেই শেখে। ছোট সময় যাদের উচ্চারণ সহীহ হয় না, বড় হলে আর সহজে সহীহ করা যায় না।

এ বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে কুরআনের অর্থ বোঝানো, নামাযের উদ্দেশ্য শেখানো ও ইসলাম সম্পর্কে অধিক শিক্ষাদানের সুযোগ হয় না।

পাড়াগাঁয়ে এমন অনেক বয়স্ক মানুষ দেখা যায়, যারা মাতৃভাষাও পড়তে সক্ষম নয়; অথচ ফজরের পর মসজিদে বা বাড়িতে কুরআন তিলাওয়াত করে—

www.amarboi.org

মসজিদে বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষাদানের এটাই সুফল। ছোট বয়সে নামায পড়া যেটুকু শিখেছে সারাজীবন এটুকুই ধর্মীয় সম্বল। মসজিদের ইমাম যদি নিঃস্বার্থ দীনের খাদেম হন তাহলে তার পেছনে যারা নামায আদায় করে তাদের নামাযকে বিশুদ্ধ ও উন্নত করার চেষ্টা করেন।

এটুকু শুধু ধর্মীয় শিক্ষা

এ পরিমাণ শিক্ষাকে দীন ইসলামের শিক্ষা বলা যায় না; শুধু ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা বলা যায়। অর্থাৎ এটুকু শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই ধারণা লাভ করে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে দীন হিসেবেই ইসলামের পরিচয় দিয়েছেন। দীন শব্দের অর্থ ধর্ম নয়; মানুষের জীবনের অনেক দিকের মধ্যে ধর্মীয় দিক একটি। প্রচলিত অর্থে ধর্ম বলতে বাস্তব জীবন থেকে আলাদা কতক অনুষ্ঠান বোঝায়। অথচ অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম শুধু কতক অনুষ্ঠানের নাম নয়।

দীন শব্দের মূল অর্থ মেনে চলা বা আনুগত্য। জীবনের সকল দিকেই আল্লাহ ও রাসূলকে মেনে চলার জন্য যে নিয়ম-কানুন কুরআন ও হাদীসে রয়েছে এর সবটুকুই দীন। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মুসলিমদেরকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা (নিয়ম) মেনে চলার শিক্ষাই ইসলাম দেয়। এরই নাম দীন ইসলাম।

সাধারণ জনগণের ধর্মীয় শিক্ষক হলেন, মসজিদের ইমাম ও ওয়ায়েযগণ। ইসলাম সম্পর্কে এ শিক্ষকগণের যে ধারণা, জনগণ এর বেশি কোথা থেকে শিখবে? তাই স্বাভাবিক কারণেই জনগণের নিকট ইসলাম দীন হিসেবে পরিচিত নয়; ধর্ম হিসেবেই পরিচিত।

স্কুলে দীনীয়াত শিক্ষা

স্কুলে দীনীয়াত যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় এর উদ্দেশ্যও শুধু ধর্ম শিক্ষা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থ শেখানো হয় আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নেই। ইলাহ অর্থ 'উপাস্য' করা

www.amarboi.org

হলে বোঝা গেল যে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক শুধু এটুকুই। উপাস্য মানে উপাসনা বা পূজার পাত্র। অর্থাৎ আল্লাহ উপাস্য, আর মানুষ উপাসক বা আল্লাহ দেবতা, আর মানুষ তার পূজক মাত্র। উপাসনার সময়টুকুতেই আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক। বাস্তব জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের সময় আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বলে ধারণা জন্মে না।

আরবীতে ইলাহ শব্দের আরেকটি প্রতিশব্দ হলো 'মাবুদ'। 'আবদ' মানে দাস, মাবুদ মানে যার দাসত্ব করা হয়। ইবাদাত মানে দাসত্ব। মাবুদ মানে মনিব। মনিব হুকুম করে, আর দাস হুকুম পালন করে। তাই বাংলায় ইলাহ অর্থ হুকুমকারী বা হুকুমকর্তা। সমাজে পিতামাতাসহ আরো অনেক হুকুমকর্তা আছে; কিন্তু তারা কেউ প্রভু নয়। তাই ইলাহ অর্থ হবে হুকুমকর্তা প্রভু। তাহলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থ হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ বা হুকুমকর্তা মনিব বা প্রভু নেই। অর্থাৎ আল্লাহই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। তাই আল্লাহর হুকুমের বিরোধী আর কারো হুকুম মানা চলবে না।

যে এ কালেমা কবুল করে মুসলিম হয়, সে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে যে, সে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে, তাঁর হুকুমের বিপরীতে কোনো হুকুম মানবে না— এটাই তার জীবনে চলার স্থায়ী নীতি। শুধু উপাসনার সময়ই নয়, দুনিয়ার সকল কাজ-কর্মে এ নীতি মেনে চলতে হবে— এটাই কালেমার দাবি। আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু।

স্কুলে যেটুকু ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে আল্লাহর সাথে সবসময় যে মনিব ও দাসের সম্পর্ক তা শেখানো হয় না। দীনের শিক্ষাদানে এটা কত বড় গলদ! যারা স্কুলে পড়ে তাদের মধ্য থেকেই উচ্চশিক্ষিত হয়ে দেশের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেয়। তারাই সরকারি ক্ষমতার মালিক হয়। তারা স্কুলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণ ধারণা পায় না বলে তাদের জীবন প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠে না। তাদের মধ্যে কম লোকই নিজের চেষ্টায় ইসলামী জ্ঞানার্জন করে পূর্ণ ও খাঁটি মুসলিম হওয়ার সুযোগ পায়।

www.amarboi.org

মাদরাসায় দীনী শিক্ষা

তেরো শতাব্দী থেকে সাড়ে পাঁচ শ' বছর এদেশে মুসলিম শাসন ছিল। তখন মাদরাসায় পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। সেকালে মাদরাসার বিরাট ওয়াক্ফ সম্পত্তি ছিল। ছাত্ররা বিনাবেতনে শিক্ষা পেত। উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ফ্রি শিক্ষা লাভ করত। শিক্ষকগণ মাদরাসার সম্পত্তি থেকে বেতন নিতেন। তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতেন। সরকারের প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এসব মাদরাসায়ই শিক্ষালাভ করত।

মাদরাসা আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ বিদ্যালয়, শিক্ষাগার। একই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল।

১৭৫৭ সালে এ দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হলে ইংরেজরা তাদের মনগড়া শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সকল মাদরাসার ওয়াক্ফ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। আলেমসমাজ বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পুনরায় মাদরাসা শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করেন।

কিন্তু এ শিক্ষায় শিক্ষিতদের মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার শিক্ষক হওয়া ছাড়া আর কোনো চাকরির সুযোগ না থাকায় যারা দুনিয়ার উন্নতি চায় তারা কেউ সন্তানদেরকে মাদরাসায় পড়তে দিত না। অত্যন্ত গরীবী হালে মাদরাসা শিক্ষা চলতে থাকে। ফলে কোনো রকমে এ শিক্ষা কুরআন-হাদীসকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এ জন্য মুসলিম উম্মাহ আলেমসমাজের নিকট কৃতজ্ঞ। এটুকু শিক্ষাও যদি না থাকত তাহলে হয়তো ইসলামের কিছুই বাকি থাকত না। কিন্তু গরীবী অবস্থার কারণে মাদরাসায় ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষাটুকুই দেওয়া সম্ভব হয়। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার না থাকায় ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষাসহ ইসলামের সকল দিকের শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করা স্বাভাবিক ছিল না।

www.amarboi.org

১৯৪০ ও ’৫০-এর দশকে ইকামাতে দীনের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীন হওয়ার পর এ দেশে ইসলামী সরকার কায়েমের আন্দোলনে যেসব মাদরাসার শিক্ষকগণ সক্রিয় হন তাদের প্রচেষ্টায় মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচিত হলে এ শিক্ষা উন্নত মানে পৌঁছার সম্ভাবনা আছে। ফাযিল ও কামিল ডিগ্রি গ্রাজুয়েট ও মাস্টার্স-এর মর্যাদা লাভ করায় এ উন্নতির পথ সুগম হয়েছে। এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ফাযিল ও কামিলের উন্নত মানের সিলেবাস ও সে অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে বলে আশা করা যায়।

কাওমী মাদরাসাসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয় মানে উন্নীত করা সম্ভব হলে গোটা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাই পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হতে পারে।

ইসলাম যে অন্যান্য ধর্মের মতো একটি ধর্মমাত্র নয়; বরং এটি আল্লাহর দেওয়া পরিপূর্ণ জীবন বিধান— এ কথা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে বাস্তবে চালু হলে এ শিক্ষার বুনিয়াদী গলদ দূর হয়ে যাবে।

ঈমান শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

ইসলাম গ্রহণ করার সময় যে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা হয় তা হলো–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।’

এভাবে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা শিক্ষা দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে কালেমায়ে শাহাদাতের মূল কথাটি ‘কালেমা তাইয়েবা’ নামে পরিচিত। এ কালেমা মুখে উচ্চারণ করলেই ঈমান আনা হয়েছে বলা মোটেই সঠিক নয়। আকাইদের ইমামগণের মতে, ঈমান হলো :

ক. মুখে উচ্চারণ করা (اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ)

খ. এর অর্থ বুঝে তা সত্য বলে বিশ্বাস করা (تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ)

www.amarboi.org

কমপক্ষে এ দুটো শর্ত পূরণ না হলে, ঈমান আনা হয়েছে বলা যায় না। কারণ কালেমার শব্দগুলো আসল কালেমা নয়; কালেমা মানে কথা। শব্দগুলোর অর্থই হলো কালেমা। যেমন আগুন শব্দটি দ্বারা যে জিনিস বোঝায় সেটাই আগুন। আগুন শব্দটি কাগজে হাজার বার লেখলেও কাগজে আগুন ধরবে না, একটু গরমও হবে না। তেমনি না বুঝে লাখ বার কালেমা জপলেও ঈমান পয়দা হবে না।

হাদীসে আছে, এ কালেমা যে পড়বে সে-ই বেহেশতে যাবে। শেখালে ময়না ও টিয়া পাখিও কালেমা উচ্চারণ করতে পারে। ময়না কি বেহেশতে যেতে পারবে? কেন পারবে না? কালেমার অর্থ বোঝার সাধ্য তার নেই বলেই পারবে না। তাহলে না বুঝে উচ্চারণ করলে মানুষ কেমন করে বেহেশতে যেতে পারবে?

কালেমার মর্ম বুঝতে হবে

কালেমায়ে তাইয়েবা মানে পবিত্র কথা। এটা এমন কোনো মন্ত্র নয় যে, তা উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যেতে পারবে। আসলে কালেমা হলো দুই দফা নীতি, যা অনুযায়ী জীবনে চলার ঘোষণা বা শপথ। Two-point life-policy declaration or oath.

এ কালেমার মাধ্যমে জীবন পরিচালনার দুটো নীতি ঘোষণা করা হয় বা দুটো শপথ গ্রহণ করা হয় :

১. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে শপথ বা ঘোষণা করা হয় যে, আমি সারা জীবন একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। এর বিপরীত কারো হুকুম মানব না। বিপরীত না হলে অন্যের হুকুমও দরকার হলে মানবো।

২. রাসূল (স) যে নিয়মে বা তরীকায় আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন, আমি একমাত্র সে তরীকায়ই আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। অন্য কারো কাছ থেকে কোনো তরীকা গ্রহণ করব না।

এ দুটো শপথ যে করল সে-ই মুমিন বা ঈমানদার হিসেবে গণ্য হলো। এ ওয়াদা অনুযায়ী যে জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করে, সে অবশ্যই বেহেশতে যাবে। এ ওয়াদা করা সত্ত্বেও তার ভুল-ত্রুটি হতে পারে। সে জন্য তাকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে দয়াময় আল্লাহর কাছে তাওবা করবে। আখিরাতে

www.amarboi.org

তাঁর আমল দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয় তাহলে আশা করা যায় যে, বদী বা গুনাহ মাফ করে তাকে বেহেশতে যেতে দেওয়া হবে।

বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়

লক্ষ্য করার বিষয় যে, কালেমাটি 'লা' দিয়ে শুরু হয়েছে। লা মানে না বা নেই। নেই দিয়ে শুরু না করে 'আল্লাহু ইলাহুন ওয়াহিদ' (আল্লাহই একমাত্র ইলাহ) বলা যেত। তাহলে লা দিয়ে কেন শুরু করা হলো?

আগে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইলাহ মানে হুকুমকর্তা। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই বলে ঘোষণা করা হয়। অথচ সমাজে আরো অনেক হুকুমকর্তা আছে :

১. মানুষের ভেতরেই নাফ্স নামক অত্যন্ত শক্তিশালী এক হুকুমকর্তা আছে। মানবদেহের দাবিগুলোকেই নাফ্স বলা হয়। দুনিয়ায় ভোগ করার জন্য আল্লাহ অনেক কিছু দিয়েছেন। এসবকে আল্লাহর দেওয়া নিয়মে ব্যবহার করাই ঈমানের দাবি। কিন্তু নাফ্সের সে চেতনা নেই বলে সে যখন খুশি ও যেমন খুশি ভোগ করতে চায়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে নাফ্সকে এভাবে ভোগ করতে দেওয়া চলে না। আল্লাহর দেওয়া নিয়মে ভোগ করতে হলে নাফ্সকে অন্যায়ভাবে ভোগ করতে দেওয়া যায় না। এভাবেই ঈমানদারকে সতর্ক হয়ে চলতে হয় এবং নাফ্সের অন্যায় দাবি মানতে অস্বীকার করতে হয়।

২. আল্লাহর দেওয়া নিয়মের (শরীআতের) বিরোধী অনেক প্রথা ও রসম-রেওয়ায সমাজে চালু আছে, যা মানুষ মেনে চলতে বাধ্য হয়। এসবও বেশ শক্তিমান হুকুমকর্তা। ঈমানদারকে এ ব্যাপারেও সতর্ক হতে হয় এবং শরীআতবিরোধী প্রথাকে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে হয়।

৩. মানুষের উপর মানুষের শাসন চলে। স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসন, সন্তানের উপর পিতামাতার শাসন, জনগণের উপর সরকারের শাসন ইত্যাদি। শাসনক্ষমতা যাদের হাতে থাকে, তারা অধীনস্থ লোকদের হুকুমকর্তা। তারা যদি আল্লাহর হুকুমের বিরোধী হুকুম করে তাহলে ঈমানদারের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি

www.amarboi.org

হয়। ঈমানের দাবি পূরণ করতে হলে শরীআতবিরোধী হুকুম অমান্য করার হিম্মত করতে হয়। এর ফলে ঈমানদারদেরকে যুলুম-নির্যাতনও ভোগ করতে হতে পারে।

৪. আয়-রোজগারের জন্য সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেই হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের হুকুম মেনেই চাকরিরতদেরকে চলতে হয়। তাদের কোনো হুকুম শরীআতবিরোধী হলে ঈমানদার চাকরিজীবী বিরাট সমস্যার শিকার হন। কর্তাদের হুকুম না মানলে চাকরি হারানোর ভয়; অথচ ঈমান বাঁচাতে হলে শরীআতবিরোধী হুকুম অমান্য করতে হবে।

৫. সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ময়দানে এমন কতক লোক বা সংগঠন গড়ে উঠতে পারে, যারা তাদের অনুসারীদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য দাবি করে। ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো ধর্মনেতা শরীআতবিরোধী হুকুম জারি করতে পারে, যা না মানলে গুনাহ হবে বলে ধারণা সৃষ্টি করে। এমন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রী থাকতে পারে, যে দলীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে শরীআতবিরোধী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে, যা অমান্য করলে দল থেকে বের করে দিতে পারে।

উপরিউক্ত পাঁচ রকম শক্তিশালী হুকুমকর্তাকে অস্বীকার করা বা তাদের হুকুম অমান্য করা অত্যন্ত কঠিন। ঈমানের হেফাযতের প্রয়োজনে এ কঠিন কর্তব্যটি অবশ্যই পালন করতে হবে। এর পরিণামে মানসিক, দৈহিক, আর্থিক ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে; কিন্তু ঈমানের এ পরীক্ষায় পাস করতে না পারলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের কামিয়াবী বা সাফল্য হাসিল করা যাবে না। এসব শক্তিকে কুরআনের পরিভাষায় 'তাগূত' বলা হয়েছে। এরা মানুষকে তাদের হুকুমের গোলাম বানাতে চায়।

সূরা বাকারায় আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহর সার্বভৌম গুণাবলির উল্লেখ করার পর ২৫৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى -

'যে (প্রথমে) তাগূতের প্রতি কুফরী করল (তাগূতকে মানতে অস্বীকার করল), এরপর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, সে-ই ঐ মযবুত রশি ধরল, যা ছিঁড়বে না।'

www.amarboi.org

এ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আগেই তাগূতের কাফির হতে হবে। তা না হলে ঈমান আনার দ্বারা আল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক হওয়ার কথা তা তাগূতের চাপে পদে পদে ছিন্ন হয়ে যাবে।

ঈমান শিক্ষাদানে এটাই বুনিয়াদী গলদ যে, ঈমান শিক্ষা দেবার সময় শুধু ইতিবাচক বিশ্বাসের কথা শেখানো হয়, তাগূতের কোনো উল্লেখই করা হয় না। ফলে স্বাভাবিক কারণেই ঈমান দুর্বল হয় এবং পদে পদে তাগূতের চাপে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়। প্রথমেই তাগূতকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে কালেমাটি 'লা' দিয়ে শুরু করা হয়েছে।[১]

মযবুত ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে আমার লেখা 'মযবুত ঈমান' বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। মযবুত ঈমান হাসিল করার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে :

১. ঈমানকে শিরকমুক্ত হতে হবে। অথচ ঈমান শেখানোর সময় শিরক সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেওয়া হয় না। আমার লেখা 'তাওহীদ ও শিরক এবং তিন তাসবীহর হাকীকত' বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. আল্লাহর উপর ঈমান আনার আগেই তাগূতকে চিনে অস্বীকার করতে হবে।

ঈমানদার হিসেবে চলার জন্য ইসলামের ইলম বা জ্ঞান জরুরি

কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী চলতে হলে একজন মুমিন যা-ই করবে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী চলতে হবে। তাহলে তাকে সব বিষয়েই আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা জানতে হবে। না জানলে কাফিরের মতোই তাকে চলতে হবে।

পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল, খাওয়া-দাওয়া, আয়-রোজগার, বিয়ে-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, ঘুম ইত্যাদি সবই আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা মেনে করতে হবে। তাই এসব বিষয়ে জানতে হবে।

এ জ্ঞানকে 'ওহীর ইলম' বলা হয়। ইলম মানে বিদ্যা বা জ্ঞান। আল্লাহ তাআলা

---

১. এ লেখায় তাগূত সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা সম্ভব হলো না। বিস্তারিত জানতে হলে আমার লেখা 'খাঁটি মুমিন হতে হলে তাগূতের পাকা কাফির হতে হবে' পুস্তিকাটি পড়ুন।

www.amarboi.org

তাঁর রাসূল (স)-কে যে ইলম দান করেন তা-ই ওহীর ইলম। রাসূল (স) বলেছেন, এ ইলম তালাশ করা ফরয। এ ইলম জানলে মুমিনের মতো চলা সম্ভব। না জানলে কাফিরের মতোই চলতে হয়।

মুমিন-মুসলিম হিসেবে দুনিয়ায় চলতে হলে যে কাজই করা হয় আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা জেনেই তা করতে হবে। ওহীর ইলম ফরয হলেও সবাইকে সবটুকু ওহীর ইলম শেখার দরকার হবে না। ওহীর ইলম তো বিশাল। গোটা ত্রিশ পারা কুরআন ও লক্ষ লক্ষ হাদীসের ইলম রাসূল (স) ছাড়া আর কারোই জানা সম্ভব নয়। তাহলে ওহীর ইলম কতটুকু ফরয?

যার উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব নেই, এ বিষয়ে তার ইলম তালাশ করতে হবে না। যে ব্যবসা করে না তার এ বিষয়ে না জানলেও ক্ষতি নেই। যার উপর হজ্জ ফরয নয়, তার এ ইলম জানাও ফরয নয়। যার বিয়ে হয়নি তার উপর দাম্পত্য-জীবনের ব্যাপারে ওহীর ইলম জানা ফরয নয়।

মুসলিম জনগণকে এসব কথা বোঝানোর দায়িত্ব কার? যারা দেশ শাসন করেন, জেলার ডিসি, থানার নির্বাহী অফিসার ইত্যাদি যত সরকারি দায়িত্বশীল আছেন, তারা যদি এ দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে সবাই এ বিষয়ে সচেতন হতে পারে। এ জন্য ইসলামী সরকার প্রয়োজন।

মসজিদের ইমাম, খানকাহর পীর, ওয়ায়েয, মাদরাসার শিক্ষকগণ যতটুকু জনগণকে শেখানোর চেষ্টা করেন এর বেশি জনগণ কোথা থেকে শিখবে? তারা কি সবাই এভাবে কালেমার মর্ম ও ওহীর ইলম শেখার গুরুত্ব বোঝান? এসব না শেখানো ঈমান শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ।

মুসলমানের ঘরে পয়দা হলেই কি মুসলমান হয়ে যায়?

মানুষের সন্তান মানুষই হয়, গরু-ছাগল হয় না। কিন্তু মুসলমানের সন্তান হলেই নিজে নিজে আপনিতেই মুসলমান হয়ে যায় না। রাসূল (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশু মানবপ্রকৃতি (ফিতরাত) নিয়েই পয়দা হয়। তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।' অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে ইহুদী-নাসারা হয়ে

www.amarboi.org

জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃতি মানে সৃষ্টিজগৎ। সৃষ্টিজগতে সবই জন্মগতভাবে স্রষ্টার বিধানমতো চলতে বাধ্য। সে হিসেবে সকল সৃষ্টিই মুসলিম। কিন্তু মানুষকে এভাবে বাধ্য করা হয় না বলে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর অনুগত হওয়ার যোগ্য হলেও পিতামাতা মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টা না করলে সে মুসলিম হবে না।

পিতামাতা চেষ্টা করে শিশুকে তাদের ইচ্ছামতো গড়ে তোলা সত্ত্বেও শৈশবের পর সন্তান নিজের স্বাধীন মতানুযায়ী অন্য কিছুও হয়ে যেতে পারে। যেমন নবীর সন্তানও কাফির হয়ে যেতে পারে, কাফিরের সন্তানকেও আল্লাহ নবী নিয়োগ করতে পারেন, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মনেতাও ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।

ডাক্তারের সন্তান ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা না করে উত্তরাধিকার বলে ডাক্তার হিসেবে দাবি করলে কি তাকে কেউ স্বীকার করবে? মুসলমানের সন্তান ইসলাম সম্পর্কে মূর্খ হলে এবং কাফিরের মতো বাস্তব জীবনে আচরণ করলে তাকে আল্লাহ তাআলা কেন মুসলিম বলে স্বীকার করবেন?

মুসলিম সমাজে যারা জনগণকে ইসলামী শিক্ষা দান করেন তারা হলেন মসজিদের ইমাম, মাদরাসার শিক্ষক, খানকাহর পীর, তাবলীগের মুবাল্লিগ ও ওয়ায়েয। সাধারণ জনগণকে তারাই দীনের ইলম দান করেন। যারা তাদের সংস্পর্শে আসে তারা কিছু দীনের আলো পায়। তারা এদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন, যাতে জনগণের মধ্যে এ কথার চর্চা করে যে, আল্লাহর নিকট মুসলিম হিসেবে গণ্য হতে হলে ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে হবে ও মেনে চলতে হবে। বিশেষ করে ছেলেমেয়েদেরকে স্কুলে পাঠানোর আগেই কুরআন পড়া শেখাতে হবে এবং নামাযের অভ্যাস করাতে হবে।

নামায শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

১. নামাযের উদ্দেশ্য শেখানো হয় না : যারা নামায শেখান তারা নামাযে যা যা করতে হয় ও পড়তে হয় তা শেখান। এতে যে শেখে সে নামাযকে শুধু একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবেই বুঝে।

মানুষ বিনা উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে না। আল্লাহ তাআলাও বিনা উদ্দেশ্যে কোনো হুকুম করেন না। নামাযের হুকুম তিনি দিয়েছেন দুটো উদ্দেশ্যে :

www.amarboi.org

ক. আল্লাহকে মনে রাখার উদ্দেশ্যে أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي 'আমাকে স্মরণ রাখার জন্য নামায কায়েম করো।' (সূরা ত্বা-হা : ১৪)

নামায কিভাবে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে সাহায্য করে? নামায ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ বার মসজিদে জামাআতে আদায় করতে হয়। নামাযের সময় তো আল্লাহকে স্মরণ করা হয়ই, নামাযের বাইরেও এ নামায আল্লাহকে ভুলতে দেয় না। কারণ, ফজরের নামাযের পর দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকলেও যোহরের নামাযে মসজিদে হাজির হওয়ার দিকে খেয়াল রাখতে হয়। মুসল্লি মসজিদে নামায শেষ হলে বের হয়ে যাওয়ার সময় মনটা মসজিদেই রেখে যায়। শত ব্যস্ততার মধ্যেও কান খাড়া থাকে কখন যোহরের আযান হয়। নামাযের সময় হলেই মসজিদে হাজির হয়ে যায়। এভাবে দিনে পাঁচ বার নামাযে হাজির হতে হয়। নিয়মিত যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে নামায আল্লাহকে মনে রাখতে সাহায্য করে।

খ. নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে :

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ـ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে (সূরা 'আনকাবূত : ৫৪)।' এটা কেমন করে হয়? এ বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নামাযের এ উদ্দেশ্যটি না বোঝালে নামায বাস্তবে কোনো উপকারে আসে না।

কালেমা তাইয়েবা কবুল করে ঈমান আনার পর প্রথম কর্তব্যই হলো পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে নামায আদায় করা। নামাযই ঈমান আনার প্রথম প্রমাণ। দিনে বার বার নামাযের হুকুম করার উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝতে হবে।

কালেমা তাইয়েবায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আমি একমাত্র আল্লাহর হুকুম এবং রাসূল (স)-এর তরীকা মেনে চলব। ঈমানদারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবে পালন করার ট্রেনিং দেওয়াই নামাযের আসল উদ্দেশ্য। মুমিনের জীবনের ২৪টি ঘণ্টা নামাযকে কেন্দ্র করেই চলে। ২৪ ঘণ্টার রুটিনের শুরুই হলো ফজরের নামায দিয়ে আর শেষ হলো ইশার নামায দিয়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর প্রথম কাজই হলো নামায। এর আগে পেশাব-পায়খানা ও ওযূ-গোসল নামাযেরই প্রস্তুতি।

www.amarboi.org

নামাযের শুরু থেকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা পর্যন্ত নামাযে থাকাকালে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকায়ই সবকিছু করতে হয়। নিজের ইচ্ছায় নামাযে কিছুই করা বা বলা যায় না। আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বাইরে করলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। দিনে পাঁচ বার নামাযে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এবং মনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী ব্যবহার করার অভ্যাস করানো হয়।

এর উদ্দেশ্য এটাই যে, নামাযের বাইরেও শরীর ও মনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূল (স)-এর তরীকা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। নামাযে এ ট্রেনিংই দেওয়া হয় যে, জীবনের সব কাজে-কর্মেই মুমিনকে নামাযে দেওয়া ট্রেনিং অনুযায়ী তার হাত-পা, চোখ-কান, মুখ ও মনকে আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকামতো ব্যবহার করতে হবে। তবেই তার জীবনে নামায সঠিকভাবে কায়েম হবে এবং নামাযের উদ্দেশ্য সফল হবে।

নামাযের এ মহান উদ্দেশ্য বুঝে নামায আদায় করলে অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকার যোগ্যতা হবে। যারা নিয়মিত নামায পড়া সত্ত্বেও মন্দ কাজ থেকে ফিরে থাকতে পারে না তারা নামাযের ঐ উদ্দেশ্য বুঝে না।

আল্লাহর কথা তো মিথ্যা হতে পারে না। তিনি বলেছেন যে, নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। যারা নামায পড়ে, অথচ মন্দ কাজ করে তাদের নামায ঐ নামায নয়, যে নামায মন্দ কাজ থেকে ফেরাতে পারে। এটা এ কারণেই যে, তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে নামায পড়ে। তারা নামাযের উদ্দেশ্যই বুঝে না। নামায শিক্ষাদানে এটা সবচেয়ে বড় গলদ।

২. নামায শিক্ষা দেবার সময় নামাযে যা মুখে উচ্চারণ করে পড়তে হয় তা শেখানো হয় এবং শরীর দিয়ে যা কিছু করতে হয় (দাঁড়ানো, রুকূ' করা, সিজদা দেওয়া ইত্যাদি) তা শিক্ষা দেওয়া হয়। নামাযে যা পড়া হয় সে সময় মনে মনে কী খেয়াল করতে হবে তা মোটেই শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে নামাযের সময় মনটা একদম খালি হয়ে থাকায় শয়তান হাজারো কথা নামাযে মনে করিয়ে দেয়। মনতো কখনো খালি থাকে না। মনকে খালি রাখলেই বিপদ। কারণ,

www.amarboi.org

শরীর ক্লান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেও মন ক্লান্ত হয় না। শরীর ঘুমিয়ে পড়লেও মন ঘুমায় না। মন সব সময় কাজ করতে থাকে। মনকে কাজ না দিলে শয়তান তাকে বেগার (বিনা বেতনে) খাটায়।[২]

আমরা শরীর দিয়ে নামাযে যা যা করি তাতে নামাযের দেহ তৈরি হয়; কিন্তু নামাযের সময় মনকে খালি রাখায় সে নামায প্রাণহীন থেকে যায়। নামাযের প্রতিটি অবস্থায় মনে কী খেয়াল করতে হবে তা জেনে মনকে কাজ দিলে নামায জীবন্ত হয়। আর নামায জীবন্ত না হলে নামাযের উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে না। প্রাণহীন দেহ যেমন কোনো কাজের নয়, প্রাণহীন নামাযও আসল নামায নয়।[৩]

৩. নামায শিক্ষাদানে আরেকটি বড় গলদ হলো নিয়তের জন্য আরবী ভাষায় রচিত নিয়ত শিক্ষা দেওয়া। হাদীসে এমন কোনো শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কোনো আরব দেশে তা চালু নেই। 'নামাযশিক্ষা' নামের বইয়ে এদেশে নামায শিক্ষার্থীদের উপর আরবীতে নামাযের নিয়ত শিখতে বাধ্য করে রীতিমতো যুলুম করা হয়। কারা কবে এ বিদ'আত আবিষ্কার করেছেন তা জানার উপায় নেই। নিয়ত মনে মনে করা হয়। এটা মনেরই কাজ। নামাযের উদ্দেশ্যে যখন ওযূ করে জায়নামাযে দাঁড়ানো হলো তখনই নিয়ত হয়ে গেল। মুখে আরবীতে নিয়তের উচ্চারণ দরকার নেই। মুখে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধলেই নামায শুরু হয়ে গেল।

রমযানে রোযা রাখার নিয়তেই শেষরাতে উঠে সেহরী খাওয়া হয়। নিয়তের জন্য এটাই যথেষ্ট। সেহরী খাওয়ার পর ছোট সময় আরবীতে নিয়ত উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছি। এমন কোনো শিক্ষা রাসূল (স) দেননি। এ বিদ'আতও আমাদের দেশে চালু করা হয়েছে।

৪. নামায শিক্ষা দানে আরো একটা ত্রুটির কারণে অনেক লোকেরই নামায শুদ্ধ হয় না। সময় ও শ্রম খরচ করে নামায আদায় করা সত্ত্বেও সে নামায কবুল হওয়ার যোগ্য হতে পারে না। কারণ নামাযের কয়েকটি ওয়াজিব আদায় করা হয় না।

---

২. আমার লেখা 'মনটাকে কাজ দিন' পড়ুন।
৩. আমার লেখা 'জীবন্ত নামায' থেকে বিস্তারিত জেনে নিন।

www.amarboi.org

নামাযে যদি কোনো ফরয আদায় না হয় তাহলে নতুন করে নামায আবার পড়তে হয়। যদি কোনো ওয়াজিব ভুলে আদায় না হয় তাহলে সাহু সিজদা দ্বারা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি ওয়াজিব আদায় করা না হয় এবং সাহু সিজদাও না করা হয় তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যায় এবং আবার পড়া কর্তব্য হয়ে যায়।

নামায শিক্ষাদানের সময় সঠিক শিক্ষা না দেওয়ার কারণে কয়েকটি ওয়াজিব আদায় হয় না। বিশেষ করে রু'কূতে গিয়ে স্থির হওয়া, রু'কূ থেকে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবে সোজা হওয়া, রু'কূ থেকে সিজদায় গিয়ে স্থির হওয়া, দু' সিজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় স্থির হওয়া। অনেক নামাযীকেই রু'কূ সিজদা অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে আদায় করতে দেখা যায়। অথচ এসব কয়টিতেই স্থির হওয়া এবং কমপক্ষে একবার সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বা আ'লা পড়তে যতটা সময় দরকার ততক্ষণ স্থিরভাবে থেমে থাকা ওয়াজিব।

আহলে হাদীসের অনুসারীদেরকে রু'কূর পর দাঁড়িয়ে দু'আ পড়া ও দু' সিজদার মাঝখানে বসে দু'আ করার শিক্ষা দেওয়া হয় বলে তাদের এ কয়টি ওয়াজিব আদায় হয়। এসব দু'আ পড়া ওয়াজিব না হলেও নামাযের ওয়াজিব আদায়ের সহায়ক বলে নামায শিক্ষা দেওয়ার সময় এসব দু'আ শেখানো উচিত। তাকবীর তাহরীমের পর হামদ ও সানা পড়া ওয়াজিব না হলেও তা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকেও শেখানো হয়। তেমনিভাবে রু'কূ সিজদার বেলায়ও শেখানো দরকার।

নামায এমন একটি ইবাদত যা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ধীরে সুস্থে সবকিছু করা এবং যা পড়া দরকার তা সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে পড়া প্রয়োজন। খুশু' ও খুযু' (বিনম্রতা ও একাগ্রতা) হলো নামাযের রূহ। তাড়াহুড়া করে নামায পড়লে নামায প্রাণহীন হয়ে যায়। নামায শিক্ষাদানের সময় এ কয়টি শিক্ষা দেওয়া না হলে নামায সঠিক হতে পারে না।

কুরআন শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ

শৈশবকালেই মসজিদ-মক্তবে ছেলেমেয়েদেরকে আরবীতে কুরআন শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এছাড়াও ইবতেদায়ী মাদরাসাগুলোতে কুরআন তিলাওয়াত শেখানো হয়, হিফযখানাগুলোতে কিশোর বয়সেই কুরআন মুখস্থ

www.amarboi.org

করানো হয়। সরকারিভাবে এসব ব্যবস্থা করা না হলেও আল্লাহর রহমতে জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় কুরআনের এসব মহান খিদমত হচ্ছে। এ শিক্ষাব্যবস্থা আছে বলেই জনগণের মধ্যে এমন অনেক পুরুষ ও মহিলা আছে, যারা মাতৃভাষায় কোনো বই পড়তে না পারলেও কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে। অনেকে ঠেকে ঠেকে হলেও তিলাওয়াত করে থাকে। অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও তিলাওয়াত করে, কিন্তু অর্থ বোঝার চেষ্টা করে না।

কুরআন শিক্ষাদানে বুনিয়াদী গলদ এটাই যে, শিক্ষার্থীরা শুধু এটুকু ধারণাই পায় যে, কুরআন পবিত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা তিলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে ১০টি করে নেকী লাভ হয়। শিক্ষার্থীদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া হয় না যে, আল্লাহ তাআলা কী উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন। এ কারণেই জনগণের মধ্যে এ ধারণা জন্মে না যে, কুরআন কী ধরনের কিতাব।

শৈশবকালেই কুরআন শিক্ষাদানের সময় বার বার এ কথা ছেলেমেয়েদের মগজে ঢুকাতে হবে যে, মানুষ কিভাবে চললে দুনিয়াতে শান্তি ভোগ করতে পারবে এবং আখিরাতে বেহেশতে যেতে পারবে। সারা জীবনই এ কিতাব থেকে তা বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন এ কিতাবের শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। মুসলিম হিসেবে নারী-পুরুষ সবার জন্যই এ শিক্ষার চেষ্টা করা ফরয। যে এ শিক্ষার গুরুত্ব বুঝবে, সে কিছু না কিছু চেষ্টা করবেই।

শৈশবে এটুকু শিক্ষা না দেওয়ার ফলে যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে তাদের কথা তো বলারই নয়, যারা নিয়মিত কুরআন পড়ে তারাও কুরআনের অর্থ জানার কোনো প্রয়োজনবোধ করে না। আলেম সমাজে পর্যন্ত তাফসীর চর্চা কমই হয়ে থাকে। মাদরাসাগুলোতে ফাযিল ও কামিলে হাদীস ও ফিক্‌হে-এর তুলনায় তাফসীর ক্লাসে খুব কম ছাত্রই দেখা যায়।

মাদরাসার শিক্ষকদের মধ্যে শাইখুল হাদীস প্রচুর আছেন। শাইখুল কুরআন খুবই নগণ্য। অথচ হাদীস ও ফিক্‌হের ভিত্তিই হলো কুরআন।

আগে ধর্মসভা ও ওয়ায মাহফিল হতো। আজকাল তাফসীর মাহফিল বেশ হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রচেষ্টায়ই কুরআন চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

www.amarboi.org

মসজিদ, মক্তব ও মাদরাসায় আরবীতে কুরআন শিক্ষাদানের সময়ই সবাইকে কুরআন বোঝার গুরুত্ব শিক্ষা দেওয়া হলে এ বুনিয়াদী গলদ দূর হতে পারে।

তিন তাসবীহ শিক্ষাদানে গলদ

হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ও ঘুমানোর আগে তিন তাসবীহ পড়ার কথা অনেকেই জানে এবং নিয়মিত পড়ে। তিনটি তাসবীহ হলো সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। নামাযের শেষে এ তিনটি তাসবীহর প্রতিটি ৩৩ বার করে আঙুলের গিরায় গুনে একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' পড়তে হয়। আর ঘুমের সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ ও ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে হয়।

এ তাসবীহগুলো মুখে উচ্চারণ করার সময় যেসব কথা খেয়ালে রাখা দরকার তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন[৪] মুখে যে যিকর করা হয় সে অনুযায়ী মনে ভাব না জাগলে যিকর প্রাণহীন হয়ে যায়।

এ তিনটি তাসবীহ যে আসলে তাওহীদেরই ঘোষণা তা শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাওহীদই ইসলামের প্রাণশক্তি। তাই প্রতি নামাযের শেষে তাওহীদের চেতনাকে শাণিত করার উদ্দেশ্যেই তিন তাসবীহর যিকর। না বুঝে এবং মনকে খালি রেখে মুখে জপ করা অর্থহীন, নিষ্ফল ও মূল্যহীন।

ইসলাম শিক্ষাদানে নারী ও পুরুষে পার্থক্য

ইংরেজ শাসনামলে আলেমসমাজ দীনের শিক্ষা ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে মাদরাসা কায়েম করেন। সেসব মাদরাসায় শুধু পুরুষরাই শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে আলেম হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মহিলা মাদরাসা কায়েম করে মেয়েদেরকে আলেমা হওয়ার ব্যবস্থা কেন করা হয়নি তা বিস্ময়ের বিষয়।

দীন ইসলামের শিক্ষা নারী-পুরুষ সবার উপরই ফরয। আলেমসমাজ নিজের ছেলেদেরকে হাফেয ও আলেম বানানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মেয়েদেরকে শুদ্ধ

---

৪. এ বিষয়ে 'তাওহীদ শিরক ও তিন তাসবীহর হাকীকত' নামক আমার লেখা বইটি দেখুন।

www.amarboi.org

করে কুরআন পড়া ও নামায-রোযাসহ প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন।

আমাদের দেশে মাত্র ২/৩ দশক পূর্বে মহিলা মাদরাসা কায়েম করার প্রচলন শুরু হয়েছে। এখনো এর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

পুরুষদের মধ্যে প্রচুর আলেম তৈরি হওয়ায় তাদের প্রচেষ্টায় আধুনিক শিক্ষিতদের মধ্যেও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটছে। ইসলামবিরোধী পুরুষদের মোকাবেলা করার জন্য আধুনিক শিক্ষিত প্রচুর পুরুষও যোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু মহিলারা আধুনিক শিক্ষায় অগ্রসর হলেও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা নারী অধিকারের নামে ইসলামবিরোধী দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। যদি আগে থেকে মহিলাদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় আলেম তৈরি হতো তাহলে তাদের প্রচেষ্টায় আধুনিক শিক্ষিতা নারীদের মধ্যেও ইসলামী শিক্ষার প্রসার ঘটত। বর্তমানে একশ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিতা ইসলামবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। পুরুষদের মতো মহিলা মহলে যদি প্রচুর আলেমা থাকত তাহলে এর মোকাবেলায় যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারত। পুরুষ আলেমসমাজের প্রতিবাদকে নারী অধিকারের বিরুদ্ধে পুরুষদের পক্ষপাতিত্ব বলে অপপ্রচারের সুযোগ পেয়েছে। মহিলা আলেমসমাজ গড়ে উঠলে এ সুযোগ তাদের হতো না।

দাওয়াতে দীনে নারী-পুরুষে পার্থক্য

পুরুষ মহলে প্রচুর আলেম থাকায় এবং তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রচুর আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ায় পুরুষদের মধ্যে যে হারে দাওয়াতে দীন বা ইসলামী আন্দোলন প্রসার লাভ করছে, মহিলাঙ্গনে সে হার অনেক কম।

মহিলা আলেমের সংখ্যা বেশি থাকলে ইকামাতে দীনের আন্দোলন মহিলাঙ্গনে আরো ব্যাপক হতো। মহিলাদের মধ্যে মহিলারা দীনের দাওয়াত দিলে যে প্রভাব পড়ে, পুরুষদের দাওয়াতে তেমন প্রভাব পড়া স্বাভাবিক নয়। বাড়ি থেকে বের হয়ে অন্য মহিলাদের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে এখনো কতক

www.amarboi.org

আলেম এবং অনেক দীনদার পুরুষ আপত্তি করেন। তাদের ধারণা যে, মহিলারা শুধু পরিবারের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিলেই যথেষ্ট। বাড়ির বাইরে গিয়ে অন্য মহিলাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব মহিলাদের নেই। এ ভুল ধারণা তারা কোথায় পেলেন আল্লাহই ভালো জানেন। এটিও একটি বুনিয়াদী গলদ।

কতক ইসলামী পরিভাষার সংকীর্ণ বা ভুল অর্থ

১. ইলাহ

এ পুস্তিকায়ই ইলাহ শব্দের সঠিক অর্থ আলোচনা করা হয়েছে যে, ইলাহ মানে মাবুদ বা একমাত্র হুকুমকর্তা প্রভু। প্রচলিত অর্থ করা হয় উপাস্য, যা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও ভুল।

২. দীন

আগে আলোচনা করেছি যে, দীন অর্থ করা হয় ধর্ম। এ অর্থ একেবারেই ভুল। দীনের সঠিক অর্থ হলো আনুগত্য। দীন ইসলাম মানে হলো আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে আল্লাহর প্রেরিত জীবনবিধান।

৩. ইবাদাত

আবদ মানে দাস বা গোলাম। আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর দাস। দাসের কাজ হলো দাসত্ব করা বা হুকুম মেনে চলা। ইবাদাত মানে হলো দাসের কাজ। ইবাদাত অর্থ দাসত্ব। আল্লাহর সকল হুকুম পালন করাই ইবাদাত।

আমাদের সমাজে ইবাদাত শব্দের অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি ধর্মীয় কাজগুলোকে শুধু ইবাদাত মনে করা হয়। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে রোজগার করতে হয়, বিয়ে-শাদি করতে হয়, সন্তান লালন-পালন করতে হয়। এসব কাজকে দুনিয়াদারি কাজ মনে করা হয়, ইবাদাত মনে করা হয় না। এ ধারণা একেবারেই ভুল। এটাও বুনিয়াদী গলদ।

দুনিয়ার যাবতীয় কাজ দু রকমভাবে করা যায়। এক রকম হলো আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো নিয়মে। আরেক রকম হলো মনগড়া নিয়মে। খাওয়া-দাওয়া,

www.amarboi.org

ঘুমানো, ঘর-সংসার, আয়-রোজগার করা ইত্যাদি যদি আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের শেখানো নিয়মে করা হয় তাহলে এ সবই ইবাদাতে পরিণত হয়।

মুমিনের জীবনে দীনদারী ও দুনিয়াদারী কাজ আলাদা নয়। দুনিয়ার কাজও আল্লাহ ও রাসূলের শেখানো নিয়মে করলে দীনদারীতে পরিণত হয়। নবী-রাসূলগণ দুনিয়াদারীর কাজ ত্যাগ করে বৈরাগী বা সন্ন্যাসী বানাতে আসেননি। তাঁরা দুনিয়াদারীকেও দীনদারীতে পরিণত করার শিক্ষা দিয়েছেন।

অবশ্য নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ও দুনিয়ার অন্যান্য কাজ-কর্মে পার্থক্য আছে। তা হলো, নামায-রোযা প্রভৃতি হলো বুনিয়াদী ইবাদাত। আর অন্যান্য কাজ হলো ইবাদাত। কারণ, নামায-রোযার মাধ্যমেই মানুষকে দুনিয়ার সকল কাজকর্ম আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকা অনুযায়ী করার অভ্যাস হয়। তাই এসব শুধু ইবাদাতই নয়; বুনিয়াদী ইবাদাতও। তাই হাদীসে এসবকে ইসলামের ভিত্তি বলা হয়েছে। ভিত্তি মানেই বুনিয়াদ।

৪. জিহাদ

সাধারণত জিহাদ বললেই যুদ্ধ মনে করা হয়। কারণ, এভাবে শেখানো হয়েছে। কুরআনে যুদ্ধের জন্য কিতাল শব্দ ব্যবহার করা হয়। কাতল (قَتْل) মানে হত্যা। কিতাল মানে হত্যার কাজ। যুদ্ধে যেহেতু একে অপরকে হত্যা করে, সেহেতু যুদ্ধকে কিতাল বলা হয়েছে।

জিহাদ শব্দের অর্থ সর্বপ্রকারে চেষ্টা করা। কুরআনে আল্লাহর পথে জিহাদ করার হুকুম করা হয়েছে। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য যতকিছু করা প্রয়োজন সবই জিহাদ। দীনের দাওয়াত দেওয়া, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ট্রেনিং দেওয়া, নিজের জীবনকে ইসলাম অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করা ইত্যাদি সবই জিহাদ। এ শব্দটির মূল হলো জুহ্‌দ। এর অর্থ চেষ্টা। জিহাদ মানে বিরোধী শক্তির বাধাকে অগ্রাহ্য করে অবিরাম চেষ্টা করতে থাকা। এ চেষ্টার এক পর্যায়ে বিরোধীরা যুদ্ধও চাপিয়ে দিতে পারে। এ যুদ্ধও জিহাদেরই অংশ; কিন্তু জিহাদ বললেই যুদ্ধ বোঝায় না।

www.amarboi.org

কতক শব্দের ভুল ব্যবহার

রওযাহ

রওযাহ (رَوْضَةٌ) মানে বাগান। হাদীসে এসেছে–

مَا بَيْنَ بَيْتِى وَمِنْبَرِى رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ

'আমার বাড়ি ও আমার মিম্বরের মাঝখানে যা আছে তা বেহেশতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান।' (বুখারী)

রাসূল (স)-এর কবর বা মাযার শরীফ তাঁর বাড়িতেই অবস্থিত। মদীনার মসজিদের মিম্বর ও মাযার শরীফের মাঝখানের জায়গাটুকু সম্পর্কেই রাসূল (স) ঐ হাদীসে ইরশাদ করেছেন। এ হাদীসটি মাযার শরীফের পাশেই সোনালি বড় বড় হরফে লেখা আছে। রওযা শরীফ হলো ঐ জায়গাটুকু। তাই এখানে নামায পড়া, দু'আ করা ও কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য প্রচণ্ড ভীড় হয়। রওযা শরীফ বলতে কবর শরীফকে বোঝায় না। কবরের পর মিম্বর পর্যন্ত জায়গাটুকুই রওযা।

বিস্ময়ের ব্যাপার যে, পাক-ভারত-বাংলায় আলেমসমাজে পর্যন্ত রাসূল (স)-এর মাযার শরীফকে রওযাহ শরীফ বলা হয়। কোনো আরব এ ভুলটি করে না। তারা কবর শরীফ বা মাযার শরীফ বলে। যিয়ারত শব্দ থেকে মাযার শব্দের উৎপত্তি। যিয়ারত মানে দেখা। আর মাযার অর্থ দেখার স্থান বা যা দেখার জন্য মানুষ যায়।

শুধু রাসূল (স)-এর মাযার শরীফই নয়; যেসব কবরবাসীকে বুজুর্গ মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র মনে করা হয় তাদের কবরকেও অমুক ওলীর রওযা বলা হয়। রওযা শব্দের এ ব্যবহার মোটেই সঠিক নয়।

মীলাদ

মীলাদ (مِيلَادٌ) শব্দের অর্থ জন্মদিন। রাসূল (স)-এর জন্মদিন পালন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে মীলাদ মাহফিল বলা যেতে পারে।

www.amarboi.org

আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের দেশে যে কোনো উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মাহফিলকে মীলাদ-মাহফিল নাম দেওয়া হয়। কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, দোকান, বাড়ি ইত্যাদি উদ্বোধন করার সময় দু'আর মাহফিল করার রেওয়ায আছে। এসবের নাম দু'আর মাহফিল বলাই সঙ্গত ও সঠিক। সব দু'আর মাহফিলকে মীলাদ নামকরণ করা একেবারেই ভুল। আরো বিস্ময়ের বিষয় যে, মৃতের জন্য দু'আর মাহফিলকেও মীলাদ বলা হয়। পিতার মৃত্যুদিবস পালন উপলক্ষে যে মাহফিল করা হয় এর নামও জন্মদিবস (মীলাদ) রাখা কত হাস্যকর।

কতক ভিত্তিহীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান

১. ভাগ্যরজনী পালন

মুসলিম জনগণের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা হয়েছে যে, শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পরবর্তী এক বছরের জন্য প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেন। তাই ঐ রাতে সবাই মসজিদে সমবেত হয়ে আল্লাহর দুয়ারে ধরনা দেয়। সারা রাত জেগে নামায, তিলাওয়াত ও দু'আ করে কাটায়। যারা সারা বছর নিয়মিত নামাযও আদায় করে না, তারাও ঐ রাতে ভাগ্যবান হওয়ার আশায় না ঘুমিয়ে আল্লাহকে ডাকে।

হাদীস শাস্ত্রবিশারদগণের মতে, এ জাতীয় কোনো হাদীস সহীহ হিসেবে গণ্য নয়। তাই ভাগ্যরজনী মনে করে ঐ রাতটি জেগে ইবাদাত করার কোনো ভিত্তি শরীআতে নেই।

আলেমগণের মধ্যে যারা মনে করেন যে, ফযীলতের কথা যেসব হাদীসে আছে, তা সহীহ না হলেও পালন করা যায়– তাদের সমর্থনের কারণেই মানুষের মধ্যে ঐ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে।

ঐ রাতটি শবে বরাত নামে আখ্যায়িত। শব শব্দটি ফার্সি। এর অর্থ রাত। আর ফারসিতে ভাগ্যকে বরাত বলে। 'তার বরাত ভালো'– কথাটি এ অর্থেই বলা হয়।

www.amarboi.org

২. বিশেষ ধরনের 'মীলাদ শরীফ'

আগেই আলোচনা করেছি, আমাদের দেশে সকল দু'আর মাহফিলকেই মীলাদ শরীফ বলা হয়। এখানে বিশেষ এক ধরনের মীলাদ সম্পর্কে আলোচনা করছি।

এ মীলাদে প্রথমে কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াতের পর আরবীতে রাসূল (স)-এর জন্ম সম্বন্ধে বলা হয়, 'যখন মা আমেনার প্রসববেদনা শুরু হয় তখন হযরত হাজেরা, আসিয়া ও মারইয়াম সেখানে হাজির হন। রাতের শেষ ও দিনের শুরু হলে রাত ও দিনের মাঝামাঝি সময় রাসূল (স) জন্মলাভ করেন।'

তখনই মীলাদ-পাঠক বলেন, রাসূলের সম্মানে সবাই দাঁড়ান। দাঁড়ানোর পরই তিনি 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' দ্বারা সবাইকে নিয়ে দরূদ ও সালাম পড়া শুরু করেন। সালামের ফাঁকে ফাঁকে রাসূল (স)-এর প্রশংসাসূচক কবিতা আবৃত্তি করেন। আমরা ছোটকালে আরবী ও উর্দু ভাষায় কবিতা শুনেছি। পরবর্তীতে বাংলায়ও কবিতা পড়া হয়।

সালাম শেষ হলে সবাই বসে যান এবং 'বালাগাল উলা বিকামালিহী' দিয়ে মীলাদ শেষ করে সবাইকে নিয়ে মুনাজাত করা হয়।

'রাসূল (স) জন্মগ্রহণ করেছেন' বলার সাথে সাথেই দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য কী? এ বিষয়ে জানার জন্য চেষ্টা করতে গিয়ে আমার ধারণা হয়েছে যে, ঐ সময় রাসূল (স)-এর রূহ মুবারক সেখানে হাজির হন বলে যারা বিশ্বাস করেন তারাই এ নিয়মটা চালু করেছেন। তাঁর রূহের প্রতি সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া দাঁড়ানোর আর কোনো কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। যেখানেই মীলাদ হয় সেখানেই রাসূল (স)-এর রূহ মুবারক হাজির হয় বলে বিশ্বাস করার কোনো ভিত্তি কুরআন-হাদীসে আছে বলে কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। শুনেছি যে, আমাদের দেশে কোনো কোনো এলাকায় মীলাদ-মাহফিলে একটা চেয়ার সাজিয়ে তাতে ফুলের মালা রাখা হয়, যাতে রূহ মুবারক এসে বসতে পারেন।

হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোথাও সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূল (স) উপস্থিত হলে তাঁর সম্মানে দাঁড়ানো তিনি পছন্দ করতেন না। অথচ রূহ হাজির হওয়ার অলীক কল্পনা করেই দাঁড়ানো কর্তব্য মনে করা হয়।

www.amarboi.org

আরবীতে কিয়াম মানে দাঁড়ানো। তাই মীলাদে দাঁড়ানোকে কিয়াম বলা হয়। রাসূলের প্রতি সালাম ও দরূদ বসা অবস্থায় করা হলে মীলাদ হলো না বলে মনে করা হয়।

এ কয়টি কাজ না হলে মীলাদ শরীফ হলো না বলেই মনে করা হয়। এগুলো হলো মীলাদের আসল উপাদান।

মীলাদের আয়োজক যদি রাসূল (স)-এর জীবনী ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার জন্য কোনো যোগ্য বক্তাকে দাওয়াত দেন বা কোনো ওয়ায়েযকে ওয়ায করার জন্য আনেন তাহলে মীলাদ শরীফের পূর্বে তা করা হয়। কিন্তু মীলাদ শরীফের জন্য এটা জরুরি নয়। উপরের কয়টি কাজই হলো মীলাদ শরীফ।

অত্যন্ত সওয়াবের কাজ ও ইবাদাত হিসেবেই মীলাদ শরীফের ব্যবস্থা করা হয়। কোনো কিছু উদ্বোধন করা বা কোনো ধরনের বার্ষিকী পালন করার সময় বরকত হাসিলের নিয়তেই মীলাদ শরীফের আয়োজন করা হয়। মীলাদশেষে কিছু জিনিস খাদ্য হিসেবে বিতরণ করে উপস্থিত সবাইকে আপ্যায়ন করা হয়। এ খাদ্যকে 'তাবাররুক' বলা হয়। বরকত থেকে এ পরিভাষাটি গঠিত হয়েছে। এর মানে হলো 'বরকতময়'।

মীলাদে কিয়াম সম্পর্কে দুজন ইসলামী ব্যক্তিত্বের কথা

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-কে এক মীলাদে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়। তিনি রাসূল (স)-এর শিক্ষা সম্পর্কে চমৎকার ওয়ায করার পর বসে বসেই সালাম ও দরূদ পড়ার পর দু'আ করে বিদায় নিলেন।

মীলাদের উদ্যোক্তা পরে গিয়ে তাঁকে বললেন, দাঁড়িয়ে দরূদ ও সালাম পাঠ না করায় সবাই বলছে যে, মীলাদ তো হয়নি। তিনি বললেন, আবার আয়োজন করুন। এবার তিনি ওয়াযের শুরু থেকেই সবাইকে দাঁড়াতে বললেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছে দেখে তিনি বললেন, দাঁড়ালে যদি বেশি সওয়াব হয় তাহলে শুধু শেষ দিকে কেন, শুরু থেকেই দাঁড়ানো উচিত।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নামাযে তাশাহুদ পড়ার সময় বসে বসেই রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম

www.amarboi.org

পাঠ করা হয়। দাঁড়িয়ে সালাম দিলে যদি বেশি সওয়াব হতো তাহলে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়ই তাশাহুদ পড়ার হুকুম দেওয়া হতো।

৩. কুলখানি

কোনো মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিন মৃতের জন্য দু'আর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করা হয়। এটাও ধর্মীয় কর্তব্য মনে করা হয়। মৃতের জন্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধদেরকে নিয়ে একসাথে দু'আ করা যেতে পারে। এর দ্বারা মাহফিলে উপস্থিত সবার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং ছোটরা শেখে যে, মুরব্বি মারা গেলে দু'আ করতে হয়। অবশ্য অনুষ্ঠান করে বিশেষ কোনো দিন বা বছরে একদিন দু'আ করা জরুরি নয়। পিতামাতা ও মুরব্বিদের জন্য সব সময়ই দু'আ করা উচিত। প্রতি নামাযের পরই দু'আ করার অভ্যাস করা ভালো।

'কুলখানি' নামকরণের মূল তালাশ করে জানা গেল যে, কারা এক সময় মৃত্যুর তৃতীয় দিন সোয়া লাখ বার 'কুল হুআল্লাহ' সূরা পড়ে এর সওয়াব মৃতের উদ্দেশ্যে পাঠানোর রেওয়ায চালু করেছে। 'কুল' মানে ঐ সূরা আর 'খানি' শব্দটি ফার্সি ভাষার। এর অর্থ পাঠ করা।

রসম-রেওয়াযের ব্যাপারটা এমনই। কেউ একবার শুরু করে দিলে সমাজে তা সহজেই চালু হয়ে যায়। আর চালু হয়ে গেলে তা কর্তব্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪. চেহলাম

চেহলাম ফার্সি শব্দ। এর বাংলা হলো চল্লিশতম। মৃত্যুর চল্লিশতম দিনে মৃতের জন্য দু'আর অনুষ্ঠান করার রেওয়ায শহরাঞ্চলে সচ্ছল লোকদের মধ্যে বেশ চালু আছে।

মৃত্যুর তৃতীয় দিন ও চল্লিশতম দিন দু'আ করলে বেশি সওয়াব হবে মনে করা একেবারেই ভিত্তিহীন কথা। রাসূল (স) ছাড়া এ জাতীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার ক্ষমতা কারো নেই। কুলখানি ও চেহলামের কোনো ভিত্তি হাদীসে নেই।

দু'আর অনুষ্ঠান করা আপত্তিকর নয়। সওয়াবের উদ্দেশ্যে যেকোনো দিন অনুষ্ঠান করা যায়। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দিনেই করা জরুরি মনে করা এবং ঐ দিন করলে বেশি সওয়াব হবে বলে বিশ্বাস করা অবশ্যই দূষণীয়।

www.amarboi.org

উপরিউক্ত চারটি অনুষ্ঠান সওয়াবের নিয়তে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হয়। এ উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করতে হলে কুরআন ও হাদীসে এর পক্ষে দলিল থাকতে হবে। যদি কুরআন-হাদীসে এর ভিত্তি পাওয়া না যায় তাহলে শরীআতের পরিভাষায় তা বিদআত বলে গণ্য হয়।

আল্লাহ ও রাসূল (স) ব্যতীত আর কারো ক্ষমতা নেই যে, কোনো কাজকে সওয়াবের কাজ বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। সওয়াবের কাজ হিসেবে যেসব অনুষ্ঠান কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত নয় তা সবই বিদআত হিসেবে গণ্য। রাসূল (স) বলেছেন, 'প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতার পরিণামই জাহান্নাম।'

নাম রাখার দায়িত্ব পালনে গলদ

ছেলেমেয়েদের নাম সুন্দর ও অর্থপূর্ণ রাখা পিতামাতার দীনী দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্বে সন্তানের নাম রাখার জন্য আলেমের পরামর্শ নেওয়ার রীতি চালু ছিল। এখন আধুনিকতার রোগে ধরেছে। তাই যে কোনো ভাষার শব্দ নিয়ে নাম রাখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাসূল (স) বলেছেন, সবচেয়ে ভালো নাম আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান। এ দ্বারা জানা গেল যে, নামের এমন অর্থ হলেই সবচেয়ে ভালো হয় যাতে আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগত বলে বোঝা যায়। অন্তত এমন অর্থ যেন বুঝায় যা সুন্দর মর্ম প্রকাশ করে।

ভালো নাম রাখার গুরুত্ব এ কারণেই অত্যন্ত বেশি যে, হাশরের ময়দানে নাম ধরেই ডাকা হবে। বাজে অর্থবোধক নাম হলে সেখানেও লজ্জিত হতে হবে।

বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জাতির সবার নাম কুরআনের ভাষায় রাখার ঐতিহ্য ছিল। বর্তমানে অনেক দেশেই এ ঐতিহ্য অবশিষ্ট নেই। আমাদের দেশে আসল নাম বেশির ভাগ মুসলমানই আরবীতে রাখে। অবশ্য ডাক নাম যে কোনো ভাষায়ই রাখা হয়। তবে ডাক নামটিও এমন শব্দে রাখাই উচিত যাতে নাম শুনে মুসলিম হিসেবে চেনা যায়।

www.amarboi.org

যারা আরবী শব্দে নাম রাখেন, তারাও সুন্দর অর্থপূর্ণ কি না তা বিবেচনা করেন না। এমনকি একেবারেই অর্থহীন বা বিকৃত অর্থেও আরবী নাম রাখা হয়। এমনও দেখা যায় যে, কুরআন খুলে যে কোনো শব্দ বাছাই করে নাম রাখা হয়, যা সুন্দর নয়। যেমন জুলমত আলী। জুলমত মানে অন্ধকার। শব্দটি আরবী বলে সঠিক মনে করে রাখা হয়েছে। তাই নাম রাখার সময় নামের অর্থটি সুন্দর কি না তা যাচাই করে দেখা অত্যন্ত জরুরি। কারো নামের অর্থ মন্দ হলে রাসূল (স) সে নাম বদলে সুন্দর নাম রেখে দিতেন।

আমাদের সমাজে আলেমের অভাব নেই। নাম রাখার সময় আলেমের পরামর্শ নেবার ঐতিহ্য চালু হওয়া প্রয়োজন। আরবীতে সুন্দর অর্থপূর্ণ নামের তালিকাসহ বই বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যায়। এ জাতীয় পুস্তকের সাহায্য নিলে আলেমের পরামর্শ নিতে হবে না।

নামের ব্যাপারে একটি আজব রেওয়াজ চালু আছে। আমাকে অনেক বিয়ে পড়াতে হয়। সাইয়েটিকা রোগের কারণে বিয়ের মজলিসে যেতে পারি না। তবু অনেকে মহল্লার মসজিদে এসে বিয়ের খুৎবা দিতে ও দু'আ করতে বাধ্য করে। কাযী সাহেব খুৎবার পর ইজাব-কবুলের সময় পাত্রীর নাম উচ্চারণে নামের শুরুতে 'মুসাম্মাৎ' শব্দটি বলেন। কাবিনে পাত্রীর নামের অংশ হিসেবেই শব্দটি লেখা হয়।

আরবী ইসম (اسم) মানে নাম। এ থেকেই মুসাম্মাৎ শব্দটি গঠিত। এর অর্থ নামক। এর ইংরেজি Named. আমরা বলি, 'অমুক' নামক এক লোক ছিল, অমুক নামক এক গ্রাম, শহর বা দেশ আছে।' এ নামক শব্দটি নামের অংশ হতে পারে না। অথচ এটা অনেকেই মহিলাদের নামের পূর্বে ব্যবহার করে। পুরুষের নামের শুরুতে মুহাম্মদ লেখার রেওয়াজ আছে। মহিলাদের নামের শুরুতেও কিছু থাকা দরকার মনে করেই এ শব্দটি লেখার রেওয়াজ চালু হয়েছে।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড